ইউনিট ৮

রাজনৈতিক বিবর্তন (১৮৫৮ - ১৯০৯ খ্রিঃ)

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রায় সমগ্র উপমহাদেশ একই শাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে আসায় ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। এতে জাতীয় ভাবধারা গড়ে উঠার পথ সুগম হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। তারা শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা। আরও পরে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় সর্বভারতীয় সংগঠন 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকার ফলে এবং বিদেশী শাসনের সংগে সহযোগিতা না করার ফলে ভারতীয় মুসলমানরা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে। তাদের সেই দুর্দিনে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং বাংলার নেতা নবাব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আমির আলী। তাঁরা মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনা ও জাগরণের। হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের প্রভাব, জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নীতি, বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থায় তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা এবং চাকুরি ও শিক্ষার অধিকারসহ সর্বত্র আলাদাভাবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র চেতনা ও বোধ অঙ্কুরিত হয়। লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক সংস্কার এবং ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন সে বোধকে আরো শাণিত করে। এই পটভূমিতেই ঢাকায় জন্ম নেয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সামান্য কিছুদিন আগে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি করা হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের সে দাবির বিরোধিতা করলেও ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা মেনে নেয়। উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাছাড়া রাজনৈতিক বিবর্তন ধারায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, সিমলা ডেপুটেশন, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কার সম্পর্কেও ভালভাবে অবহিত হবেন বা আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

পাঠ ১

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- আলীগড় আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

আলীগড় আন্দোলন

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নিরুৎসাহ ও হতাশার সৃষ্টি করে। ইংরেজ শাসনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারায় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে এবং দুঃখ দুর্দশার আবর্তে নিপতিত হয়। মুসলমানদের সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে তাদের ত্রাণকর্তারূপে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ঘটে। অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুসলমানদের পুনরুদ্ধার ও তাদের পুনর্জাগরণের জন্য তিনি উত্তর ভারতে আলীগড় কেন্দ্রিক যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন, ইতিহাসে তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ।

সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবন

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম হয়। কোম্পানীর অধীনে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেরেস্তাদারের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরে সাব জজ পদে উন্নীত হন। তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, হান্টার শিক্ষা কমিশন ও ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

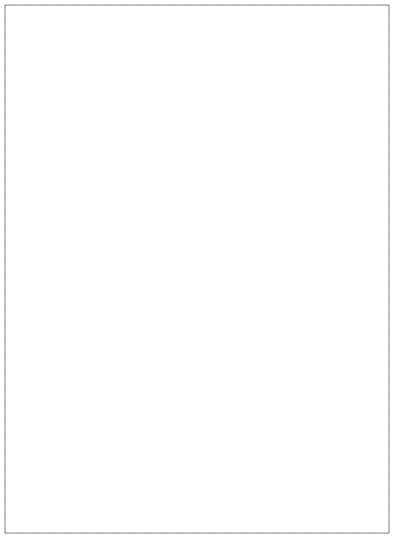

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থা সৈয়দ আহমদ খানকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা তাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। তাই প্রথমে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজ শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার উপদেশ দেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানরা শাসক শ্রেণীর বিরাগ ভাজন হয়ে পড়ে। কারণ ব্রিটিশ সরকারের ধারনা ছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের মূলে মুসলমানরা দায়ী।

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা

ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সৈয়দ আহমদ খান 'সিপাহী বিদ্রোহের কারণ' এবং 'ভারতের রাজ ভক্ত মুসলমান' নামে দু'খানি বই লেখেন। তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মুসলমানরা দায়ী ছিল না। বরং বিদ্রোহকালে অধিকাংশ মুসলমান ছিল ইংরেজদের পক্ষে। শাসক-শাসিতের দূরত্ব এবং তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এ বিপ্লবের মূলে ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'ভারতীয় মুসলমান' (The Indian Mussalaman) গ্রন্থে সে বিদ্রোহের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী

করলে যুক্তি দিয়ে সৈয়দ আহমদ তা খণ্ডন করেন। ফলে মুলমানদের প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ায় স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকা

স্যার সৈয়দ আহমদ শুধু বৃটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যেই সম্পর্কের উন্নতি করে ক্ষান্ত হননি। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রসারে উদ্যোগী হন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তর ভারতের গাজীপুরে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে রচিত মূল্যবান বইগুলো উর্দুভাষায় অনুবাদ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তিনি 'বিজ্ঞান সমিতি' নামে একটা সংস্থা গঠন করেন। পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ ও শিক্ষাব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য সৈয়দ আহমদ খান নিজে বিলাত যান। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে 'তাহজীবুল আখলাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের নৈতিকতা ও আচার ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাদের মধ্যকার কুপমন্ডুকতা ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন।

বিজ্ঞান সমিতি গঠন

একই সময়ে তিনি বেনারসে 'ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি', নামে একটি সংস্থা ও গঠন করেন। এ সমিতির সুপারিশে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। দু'বছর পরে এটি কলেজে উন্নীত হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে উক্ত 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর আলীগড় মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানে মুসলমান ছাত্ররা শুধু আধুনিক কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষাই গ্রহণ করেনি, বরং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় একাত্মার দরুন আলীগড় তাদের ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনায়ও সাহায্য করে। আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয় এবং পরবর্তীকালে এই কলেজ তাদের রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ খান 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে অন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমান নেতারা এক জায়গায় সমবেত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করতেন। আলীগড়ের বার্তা তাঁরা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেন। এভাবে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টা ও আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে।

'মোহামেডান এডুকেশনাল গঠন'

সৈয়দ আহমদ খান কুরআনের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দেন। তিনি সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তা ও আধুনিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সনাতনপন্থীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ খান দেশের অগ্রগতির স্বার্থে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলেন। কিন্তু ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে হিন্দি-উর্দু বিতর্ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। এ সময়ে উত্তর প্রদেশে নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা কোর্ট কাচারীতে উর্দুর পরিবর্তে নাগরী বর্ণমালায় লিখিত হিন্দি ভাষা প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তিনি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাতদের নিয়ে তাঁর চেষ্টায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন'। ভারতীয় জনগণের মন থেকে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করা, দেশে শান্তি রক্ষা ও সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ সময় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের কারণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'গো-

হত্যা নিবারণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা এবং সহিংসতার কারণে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে সৈয়দ আহমদ খানের আহবানে আলীগড়ে 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের জীবনসূর্য নিভে যায়। মুসলিম জাতির এক সংকটকালে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নবচেতনা জাগিয়ে তুলে তিনি তাদেরকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে বহুবিধ অবদানের মাধ্যমে তিনি আলোর পথের সন্ধান দেন। মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর সৃষ্ট আলীগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণে সৈয়দ আহমদ খানের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান উপাধি পেয়েছিলেন —
   ক. নওয়াব খ. নাইট
   গ. জমিদার ঘ. বিরোত্তম

২. 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইখানি লেখেন —
   ক. ঐতিহাসিক হান্টার খ. স্যার আবদুর রহিম
   গ. স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঘ. লর্ড ডাফরীন

৩. তাহজীবুল আখলাক হচ্ছে —
   ক. সংবাদপত্র খ. ধর্মীয় গ্রন্থ
   গ. উপাসনালয় ঘ. একটি মসজিদের নাম

৪. মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স গঠিত হয় —
   ক. ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. আলীগড় আন্দোলনের পরিচয় দিন।
২. সৈয়দ আহমদ খানের কর্মময় জীবনের বর্ণনা দিন।
৩. মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সৈয়দ আহমদ খান কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?

পাঠ ২

মুসলিম নবজাগরণ ও নওয়াব আবদুল লতিফ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- আবদুল লতিফের কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তাঁর অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান সম্প্রদায় এক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। বিদেশী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে তাঁরা একদিকে যেমন চাকুরিসহ সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে, অন্যদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক সহ জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে। এমন অধঃপতিত অবস্থা থেকে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ আসে তাঁদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ অন্যতম।

নওয়াব আব্দুল লতিফের শিক্ষা ও কর্মজীবন

আবদুল লতিফের জন্ম ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায়। কলকাতা মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে আবদুল লতিফ প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনুযায়ী বাংলায় ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠিত হলে তিনি এর সদস্য মনোনীত হন। আবদুল লতিফ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। কর্মজীবনে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার প্রথমে তাঁকে 'খান বাহাদুর' এবং পরে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করে।

নওয়াব আবদুল লতিফ

আবদুল লতিফ যখন সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি সেখানকার কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা সরকারকে অবহিত করেন এবং সুবিচারের জন্য অনুরোধ জানান। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশন গঠিত হলে এর সুপারিশ অনুসারে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়। ফলে বাংলার কৃষকরা নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পায়।

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি

নওয়াব আবদুল লতিফ নিজে ইংরেজ অনুগত ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ প্রয়োজন বলে মনে করতেন। ইংরেজ শাসকদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা লাভের স্বার্থে তিনি মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব পরিহার করে তাদের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণের জন্য মুসলমানদের অনুরোধ জানান। তাঁর প্রচেষ্ঠায় মুসলমানেরা ইংরেজদের প্রতি জেহাদী মনোভাব ত্যাগ করে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

নওয়াব আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি স্বীয় বাস্ত

মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা

ববাদী বিবেচনা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি আধুনিক শিক্ষার আলোকে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার দূর করে তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক ফার্সি ভাষায় একটা রচনা প্রতিযোগিতা আহবান করেন। এ উদ্যোগে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দারুন সাড়া জাগায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লেখা প্রেরিত হয়। আবদুল লতিফের সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলিকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-ফার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার আয়োজন করা হয়। উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানদের অসুবিধার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর চেষ্টার ফলেই কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের অধ্যয়নের সুযোগ সেখানে তৈরি হয়।

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি গঠন

আবদুল লতিফের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য কীর্তি ছিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটান এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাংলার মুসলমানদের বিদ্বেষভাব দূর করে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সমস্যা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদির উপর মূল্যবান আলোচনা হতো। মুসলমানদের রীতিনীতির সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন ঘটাবার জন্য এর মাধ্যমে চেষ্টা চলে। একবার বিখ্যাত মনীষী ও আলীগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ আমন্ত্রিত হয়ে কলিকাতায় সোসাইটির এক সভায় ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর মূল্যবান ভাষণ দেন। অন্য সময়ে মাওলানা কেরামত আলীও এ সমিতিতে বক্তৃতা করেন।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ আরও কিছু অবদান রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি সাহায্যে মফস্বলে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ঐ সব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের চেষ্টার ফলে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার হুগলী কলেজের যাবতীয় ব্যয় বহন করবে এবং দানবীর হাজী মহসীনের প্রদত্ত তহবিলের অর্থ শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হবে। পূর্বে মহসিনফান্ডের বৃত্তি হিন্দু মুসলিম সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

আবদুল লতিফ রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বাংলার মুসলমানদের দুরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষা কল্পে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সে জন্য ইংরেজ বিরোধী কর্মকান্ড থেকে তিনি তাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে তাঁর ভুমিকা উল্লেখযোগ্য ও সত্যিই প্রশংসনীয়।

সার-সংক্ষেপ

বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান ছিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের জন্যও তিনি বাংলার মুসলমানদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. নওয়াব আবদুল লতিফের জন্ম —
   ক. রাজশাহীতে খ. বগুড়াতে
   গ. ফরিদপুরে ঘ. কুষ্টিয়ায়

২. বাংলায় নীল কমিশন গঠিত হয় —
   ক. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে

৩. মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন —
   ক. হাজী মুহম্মদ মহসীন খ. নওয়াব আবদুল লতিফ
   গ. স্যার সলিমুল্লাহ ঘ. সৈয়দ আমির আলী

৪. নওয়াব আবদুল লতিফ মারা যান —
   ক. ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. নওয়াব আবদুল লতিফের শিক্ষা ও কর্ম জীবনের পরিচয় দিন।

২. মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে নওয়াব আব্দুল লতিফ জনমত গঠনের জন্য কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?

৩. মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি কখন এবং কে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংগঠনটির উদ্দেশ্য লিখুন।

পাঠ ৩

মুসলিম নবজাগরণ ও সৈয়দ আমীর আলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- সৈয়দ আমীর আলীর জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলিম নবজাগরণে তাঁর ভূমিকার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত

সৈয়দ আমীর আলীর কর্মজীবন

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের নবজাগরণে যাঁর অবদান অত্যন্ত মূল্যবান তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও বৈষয়িক অগ্রগতি লাভের পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত শিয়া পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ এবং বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করার পর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৪ সালে তিনি লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিয়োজিত হন এবং আমৃত্যু সে পদে বহাল থাকেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সৈয়দ আমীর আলী

ইংরেজ শাসনে সহযোগিতা করে মুসলমানদের উন্নতি কামনা

কর্মজীবনের শুরুতে আইন ব্যবসার পাশাপাশি সৈয়দ আমীর আলী সমাজ সেবার কাজেও মনোনিবেশ করেন। বাংলা তথা ভারতের মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনিও নওয়াব আবদুল লতিফ এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুসরণে ভারতের মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হবে, এ ধারণা তাঁদের উভয়েরই ছিল। আমীর আলীর নিকট তাঁদের এ ধারণা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে কারণে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলকাতাস্থ প্রধান শাখার নাম করণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার, ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের নায্য দাবিদাওয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের নিকট পেশ করা ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বক্তৃতা অনুষ্ঠান, সভা ও সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐক্য গড়ার প্রয়াস এর মাধ্যমে গৃহীত হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সমিতির পক্ষ থেকে ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারক লিপিতে সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এ সব প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল। নওয়াব আবদুল লতিফের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীর মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রসংখ্যা খুবই হ্রাস পাওয়ায় মহসীন তহবিলের অর্থ এসব প্রতিষ্ঠানে অনর্থক খরচ না করে কলিকাতায় একটি কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার জন্য আমীর আলী প্রস্ত াব করেন। তাঁর দাবিতে সরকার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। করাচীতে মুসলমানদের লেখাপড়ার জন্য একটি কলেজ তাঁরই উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজে ইসলামী ও পাশ্চাত্য উভয় জ্ঞানেই পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত দু'খানি গ্রন্থ 'The Spirit of Islam' এবং 'A short History of the Saracens' তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। বইগুলোর মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন।

কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা

সর্বতোভাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমীর আলী মনের দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতির দ্বারা ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যে, জাতীয় কাজকর্মে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির আন্তরিক সহযোগিতার উপর আধুনিক ভারতের উন্নতি নির্ভরশীল। তথাপি মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর তিনি লন্ডন থেকে এর প্রতি সমর্থন জানান। ১৯০৮ সালে লন্ডলে মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আমীর আলী লন্ডন মুসলিম লীগের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে ভারত সচিব লর্ড মর্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে জোরালো মতামত তুলে ধরেন। এদেশে মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আমীর ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। বস্তুত সৈয়দ আমীর আলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের এক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সে দৃষ্টিতে তাঁকেই অনেকে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক বলে মনে করেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লন্ডন শাখা প্রতিষ্ঠা

সার-সংক্ষেপ

দুর্দশায় নিপতিত বাংলার মুসলিম সমাজকে আলোর পথে টেনে তুলতে যাঁদের অবদান মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় সৈয়দ আমীর আলী তাঁদেরই একজন। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাই নয়, মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষার গুরুত্বও তিনি অনুভব করেছেন এবং সে কারণে মুসলমান সমাজকে রাজনীতি সচেতন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম —
   ক. মালদহে খ. হুগলীতে
   গ. মুর্শিদাবাদে ঘ. পাবনায়

২. মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন —
   ক. নওয়াব আবদুল লতিফ খ. এ.কে. ফজলুল হক
   গ. স্যার সলিমুল্লাহ ঘ. সৈয়দ আমীর আলী

৩. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠিত হয় —
   ক. ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে

৪. আমীর আলী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন —
   ক. ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. সৈয়দ আমীর আলীর কর্মময় জীবনের বর্ণনা দিন।
২. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের পরিচয় দিন।
৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে আমীর আলীর অবদান আলোচনা করুন।

পাঠ ৪

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন ও কেন প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কাদের ভূমিকা ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কংগ্রেসের প্রাথমিক আদর্শ ও কর্মসূচি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ সে সময়টা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের ঊষালগ্ন। বৃটিশ নীতি ও শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ও পরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে। এ সবের উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। ভারতীয় জনগণের নায্য অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠন ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব সমিতি শিক্ষিত অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনুকরণে বোম্বে ও মাদ্রাজে অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠে। শাসন সংস্কারের মাধ্যমে দেশ শাসনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও তাদের নায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এ সব প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের চেষ্টা করে। বাংলার নেতা সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সদ্ভার বজায় রাখা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরীসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে।

'বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি', 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন', 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত

ভারত উপমহাদেশে এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তাঁর সময়কালের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের দরুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমা একুশ থেকে উনিশে আনা হলে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আগ্রা, দিল্লী, আলীগড়, লাহোর, কানপুর, বেনারস ও অমৃতসরসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতিবাদ সভা হয়। এ বিক্ষোভের পরপরই শুরু হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ আইনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছিলেন। সরকারের বর্ণ

ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন

বৈষম্যমূলক অস্ত্র আইন, সাম্রাজ্যবাদী আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জাঁকজমকপূর্ণ দিল্লী দরবার ইত্যাদিও অসন্তোষের মূলে ছিল।

'ইলবার্ট' বিল' বিরোধী আন্দোলন

এসবের রেশ মুছে যেতে না যেতেই দেখা দেয় লর্ড রিপনের সময়কার ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্ক। এ বিতর্কের ফলে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে এক নিদারুন বর্ণ বৈষ্যম্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক আইন বলে ভারতে ইংরেজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিচারকার্যে শুধুমাত্র ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ক্ষমতা পাবেন বলে স্থির হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য সি.পি. ইলবার্ট প্রস্তাব করেন যে, ভারতের প্রেসিডেন্সি শহরগুলোর ন্যায় অন্যান্য স্থানেও ভারতীয় সেসন জজরা ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারবেন। এটা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা ভারতবর্ষে চরম বিক্ষোভ শুরু করে। সরকার শেষ পর্যন্ত কিছুটা আপোষ করেন এবং স্থির হয় যে ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের ক্ষেত্রে জুরী মণ্ডলীর উপস্থিতি লাগবে এবং তাদের অর্ধেক হতে হবে সাদা চামড়ার লোক।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ইউরোপীয়ানদের বিক্ষোভ ভারতীয়দের মর্যাদা ও জাতীয় চেতনায় আঘাত করে। শিক্ষিত হিন্দুরা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এলবার্ট হলে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিরা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ দিকে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার কিছুটা ভীত হয়। ভারতীয়দের দাবি ও আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য সরকার মনোযোগী হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এলান অক্টেভিয়ান হিউম ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠা করেন। দুজন মুসলমানসহ সত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেনঃ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা দেশ সেবায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা;
২. জাতি ধর্ম আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করা;
৩. শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যেমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে বের করা এবং
৪. রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য পরবর্তী বছরের কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে বৃটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে বৃটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন। প্রথম দিকে অল্প কয়েকজন মুসলমান এতে যোগদান করেন। কিন্তু এর কর্মসূচি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সহ প্রমুখ মুসলিম নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সাথে জড়িত হতে নিষেধ করেন। প্রথম দিকে কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যপন্থী। ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান হতো। কিন্তু সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ও সহযোগিতার এ নীতি অচিরেই

পরিবর্তিত হতে থাকে। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে ভারতের জন্য স্বরাজ বা স্বাধীনতার আন্দোলন করে এবং সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়।

সার-সংক্ষেপ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম দিকে বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা এবং আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায় এর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় —
   ক. ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে

২. ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করেন —
   ক. সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী খ. বাল গঙ্গাধর তিলক
   গ. আনন্দ মোহন বসু ঘ. দাদাভাই নওরোজী

৩. জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় —
   ক. কলকাতায় খ. বোম্বে
   গ. অমৃতসরে ঘ. এলাহাবাদে

৪. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন —
   ক. বিপিন চন্দ্র পাল খ. সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী
   গ. এলান অক্টেভিয়ান হিউম ঘ. মাওলানা আজাদ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

২. কংগ্রেসের প্রাথমিক আদর্শ ও কর্মসূচীর বিবরণ দিন।

৩. ইলবার্ট বিল কি?

পাঠ ৫

বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের (বাংলা বিভাগ) পটভূমি ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গ-বিভক্তি ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলের একটি প্রশাসনিক সংস্কার। ঐ সময় সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বঙ্গ প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। উপমহাদেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল এ অঞ্চলে। কার্জন এত বড় এলাকাকে একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে

রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। রাজধানী কলিকাতা থেকে সুদূর পূর্বাঞ্চলের আইন শৃংখলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রশাসনিক কারণে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দু'ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গকে আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটা নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কিন্তু কার্জনের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন গড়ে তোলে।

সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা

বাংলা প্রেসিডেন্সির সীমানা রদবদলের প্রয়োজনীয়তা অনেক পূর্ব থেকেই সরকারী মহলের বিবেচনায় স্থান লাভ করে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দু'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। পরের বছর লর্ড ডালহৌসীও একই মন্তব্য করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সচিব লর্ড নর্থকোট যে কমিটি নিয়োগ করেন তার প্রতিবেদনেও বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সুপারিশ করা হয়। এসব বিবেচনা করে সরকার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বাংলা থেকে পৃথক করে চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ হওয়ায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। ভাইসরয় নিযুক্তির অল্পদিনের মধ্যেই কার্জন ভারতের প্রদেশগুলির সীমারেখা পুনর্নির্ধারণের পূর্বের প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার বাংলার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলোর মতামত জানতে চাইলে তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য রদবদল করে পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে।

অনেক কাল আগে থেকেই প্রশাসনিক বিভক্তির চিন্তা ভাবনা চলছিল

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি প্রবল গণ-অসন্তোষের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠান হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ আসে। এমতবস্থায় লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে যান। তিনি সর্বত্রই বঙ্গবিভক্তি বিরোধী উত্তেজনা লক্ষ করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসে আরও কিছু এলাকা এর সঙ্গে যুক্ত করার ইঙ্গিত দেন, যার ফলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, একটি আইন পরিষদ ও পৃথক রাজস্ব বোর্ড নতুন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকায় এবং এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা নতুন প্রদেশে বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ফিরে গিয়ে কার্জন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং কিছু সংযোজনসহ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। নতুন বিন্যাসে আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ যুক্ত হয়। তাছাড়া দার্জিলিং বাদ দিয়ে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তিন কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী নির্বাচিত হয় ঢাকা। বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর কার্যকরী হয়।

লর্ড কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফর

বঙ্গভঙ্গ কার্যকারী হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর

'ঢাকা' 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের নতুন রাজধানী

বঙ্গবিভাগ ও নতুন প্রদেশ গঠনের পেছনে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধিই ছিল কার্জনের মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই সমগ্র বাংলার শাসন ব্যবস্থা ছিল কলিকাতা কেন্দ্রিক। এর ফলে পূর্ব বাংলা সব সময়েই ছিল অবহেলিত ও অনুন্নত। কার্জন ভেবেছিলেন যে, নতুন প্রদেশ করা হলে এ অঞ্চলের শিক্ষা, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে

বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল

এবং পূর্ববঙ্গ বাংলার অন্য অংশের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক ও সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অনেকে তাঁর এ পরিকল্পনাকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটি রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা কার্জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইংরেজ বিরোধী ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তিনি বাঙালীর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন। সে জন্য প্রধানত রাজনৈতিক কারণে তিনি কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি ও নতুন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করতে মনস্থ করেন।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লা এবং নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলো নতুন প্রদেশ গঠনে সন্তোষ প্রকাশ করে। যেহেতু পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা নানারকম সুযোগ সুবিধার আশায় বঙ্গবিভাগকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে। তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে জমিদার, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে যোগ দেয়। কলিকাতা কেন্দ্রিক ভূস্বামী ও পেশাজীবীরা নতুন প্রদেশে নানাবিধ সমস্যা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার আশংকায় বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনকে শক্তিশালী ও ব্যাপক করে তোলে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, বাল গঙ্গাধর তিলকসহ গোখলের মত উদারপন্থী নেতাও এ আন্দোলনে অংশ নেয়। বঙ্গ-বিভক্তি প্রতিরোধ সংগ্রাম পরে স্বদেশী আন্দোলনকে বেগবান করে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বৃটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে এ ঘোষণা দেন।

বৃটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

সার-সংক্ষেপ

বঙ্গভঙ্গ বিশ শতকের গোড়ার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ায় ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য বৃটিশ সরকারী মহলে অনেক প্রস্তাব আসে। শেষ পর্যন্ত মূলত প্রশাসনিক কারণে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করেন। এ প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা এতে খুশী হলেও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দু'ভাগে ভাগ করার প্রথম পরিকল্পনা করা হয় —
   ক. ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে

২. ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন —
   ক. লর্ড ডালহৌসী খ. লর্ড কার্জন
   গ. লর্ড রিপন ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ

৩. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল —
   ক. রাজশাহী খ. গোহাটি
   গ. চট্টগ্রাম ঘ. ঢাকা

৪. বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় —
   ক. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. কেন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল?

২. পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা কেন বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়?

পাঠ ৬

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা ও কেন অংশ নেয় তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- স্বদেশী পর্যায়ে এ আন্দোলনের কি রূপ ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সন্ত্রাসবাদী ও চরমপন্থীদের এ আন্দোলনে কি ভূমিকা রয়েছে তার মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ সরকার কেন বঙ্গভঙ্গ রদ করেন এ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবিভাগের কারণে বাংলার বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা শীঘ্রই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী একটি সুসংহত আন্দোলনের রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি বিদেশী পণ্য বর্জন বা বয়কটের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ব্রিটিশ বিরোধী প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের। চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলনকে প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্ব

বাংলার নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও সাধারণভাবে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষত বর্ণ-হিন্দুরা এর নেতৃত্ব দেয়। জাতীয় কংগ্রেস ছিল এ আন্দোলনের পুরোভাগে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার শ্রেণী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সাংবাদিক সবাই এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। বক্তৃতা মঞ্চ ও পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবিভক্তিকে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' 'জাতীয়তাবাদ বিরোধী' ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। নতুন সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এক প্রতিবাদ সভায় বলেন, "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হইবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে স্বদেশেই আমরা হইব প্রবাসী"। নিছক স্বার্থবোধ ও ধর্ম-ভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয় চেতনা থেকেই মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী

আন্দোলনের সূত্রপাত। এ আন্দোলন ছিল প্রধানত কলিকাতা কেন্দ্রিক। জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিল এর অগ্রভাগে। বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে এরা ছিলেন সুবিধাভোগী। জমিদারেরা তাদের প্রজাদের শোষণ করে বিপুল ঐশ্বর্য গড়ে তোলে এবং তাদের নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচারে কৃষকরা আর্থিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

ঢাকায় রাজধানী হওয়ায় ব্যবসায়ী ও বনিক শ্রেণীর স্বার্থের আঘাত আসে

ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হলে নতুন প্রদেশে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে, নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হবে। ফলে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা ও মুনাফা নষ্ট হবে এ আশংকায় কলিকাতার ধনিক শ্রেণী ও ব্যবসায়ীরা নতুন প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আইনজীবী এবং সাংবাদিকতার পেশায় জড়িতরাও অনুরূপ কারণে ভীত ছিল। সে কারণে তারা সকলেই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মহারাষ্ট্রের তিলক প্রমুখ নেতারা জাতীয়তাবাদের চেতনায় এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

জাতীয় কংগ্রেস, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কবি সাহিত্যিকদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা

হিন্দু সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। অনেকগুলো প্রতিবাদ সভা থেকে বঙ্গ বিভক্তি বাতিলের দাবি জানানো হয়। আন্দোলন জোরদার করার জন্য কংগ্রেস ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলিকাতার এক জনসভা থেকে বৃটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দেয়। অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবার দিনে হিন্দুরা 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান পালন করে এবং মিছিল ও সভাসমিতিতে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দেয়।

বিলেতীপণ্য বর্জন

শীঘ্রই স্বদেশী আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদেশী পণ্য আমদানি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয়। দেশীয় শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। আন্দোলনকারীরা বিলাতী পণ্যের সঙ্গে ইংরেজদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বর্জনের আহ্বান জানায়। ছাত্ররা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচিকে জোরদার করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সাহিত্যিক চেতনা

শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বিশেষত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কবি-সাহিত্যিকরা এ আন্দোলনকে জোরদার করতে মূল্যবান অবদান রাখে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী' এবং মতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিরোধ আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র লাল, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস প্রমুখ কবিদের রচিত দেশ বন্দনামূলক গান আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে ''আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'' গানটি রচনা করেন যা আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনকালে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে দেশাত্মবোধক ভাবের এক নতুন জোয়ার আসে।

ব্রিটিশ সরকার ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি

বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষ পূর্তি কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষেত্র বিশেষে সহিংসতার পথে ধাবিত হয়। আন্দোলনকারীদের একাংশ চরমপন্থী নেতাদের প্ররোচনায় উগ্রপন্থী কার্যকলাপ শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটান। ঢাকা ও কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। এদের মধ্যে ঢাকার 'অনুশীলন' এবং কলিকাতার 'যুগান্তর' সমিতি ছিল প্রধান। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র। এ সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় পুলিন বিহারী দাসের উপর। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় বিপ্লবীদের দ্বিতীয় দল 'যুগান্তর সমিতি'র জন্ম হয়। অরবিন্দ ঘোষ, বারিন্দ্র ঘোষ

ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এ সমিতির উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন। 'যুগান্তর' নামে সমিতির একটা পত্রিকা ও প্রকাশিত হয়।

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি

সারাদেশ গুপ্ত সমিতিগুলোর অনেক শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে। শরীরচর্চা ছাড়াও এ সব সমিতির মাধ্যমে যুবকদের অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শতশত যুবক ও ছাত্র এ আন্দোলনে যোগ দেয়। গুপ্ত হত্যার দ্বারা ইংরেজদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবী যুবকরা পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার-কে দু'বার হত্যার চেষ্টা করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই আন্দোলনে জড়িত হয়ে জীবন উৎসর্গ করেন।

কংগ্রেসী নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপোসনীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করতে মনস্থ করেন

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। লর্ড মিন্টোর পরে নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি কংগ্রেসী নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপোসনীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করতে মনস্থ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা দেন।

সার-সংক্ষেপ

লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দু'ভাগে ভাগ করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্গভঙ্গ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বেগবান হয় বিদেশী পণ্য বর্জনের স্বদেশী আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। ইংরেজ সরকার আপোসের পথ নেয় এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. বাংলার হিন্দুরা যে ঘটনাকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে দাবি করে —

ক. ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে পৃথক আসাম প্রদেশ গঠন খ. ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন

গ. ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রদেশে দ্বৈত শাসন চালু ঘ. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করা

২. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উচ্চারিত জনপ্রিয় শ্লোগান —

ক. জয়বাংলা খ. জয় হিন্দ

গ. বন্দে মাতরম ঘ. গান্ধী কি জয়

৩. 'যুগান্তর সমিতির' পত্রিকার নাম ছিল —

ক. যুগান্তর খ. অনুশীলন

গ. অমৃতবাজার ঘ. আনন্দবাজার

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা ও কেন অংশ নিয়েছিল?

২. ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনের পরিচয় দিন।

পাঠ ৭

সিমলা ডেপুটেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- সিমলা ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের উত্থাপিত দাবিগুলো কি ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলমান নেতাদের দাবির প্রেক্ষিতে লর্ড মিন্টোর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সিমলা ডেপুটেশনের গুরুত্ব অত্যধিক। ঐ বছর একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের সে দাবি পূরণ করে।

মর্লির শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ঘোষণা

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের পদত্যাগের পর লর্ড মিন্টো তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বৃটেনে একটি উদারনৈতিক সরকারের আবির্ভাব ঘটে এবং জন মর্লি ভারত সচিব নিযুক্ত হন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছিল। বঙ্গভঙ্গ বাতিলের কংগ্রেসী দাবি সরাসরি মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না বিধায় বৃটিশ সরকার কিছুটা সমঝোতামূলক মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসকে অন্যভাবে খুশী করার চেষ্টা করে এবং আইন পরিষদের গঠনকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করার কথা বিবেচনা করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় বাজেট বক্তৃতাকালে মর্লে ঘোষণা করেন যে, ভারতের আইন পরিষদের গঠনকে আরেকটু বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য ভাইসরয় শীঘ্রই একটি ছোট কমিটি নিয়োগ করবেন। উক্ত কমিটি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সুপারিশমালা প্রদান করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মর্লির ঘোষনায় মুসলমাদের প্রতিক্রিয়া

মর্লির শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ঘোষণা প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বিভিন্ন মুসলিম পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত সংস্কারে আইন-পরিষদের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের সামনে তুলে ধরা উচিত। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যানুপাতে মুসলমানদের যতগুলো আসন প্রাপ্য ছিল, নিজেদের প্রার্থী দেয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা তার অর্ধেক আসনও লাভ করতে পারেনি। এমতবস্থায় তারা অনুভব করে যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিলে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে।

আগাখানের নেতৃত্বে ভাইসরয়ের সঙ্গে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী নবাব মহসীন-উল-মুলকের অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগে মুসলমানরা তখন একটি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে তাঁদের মতামত বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড বড়লাটের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। মহামান্য তৃতীয় আগা খান দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর ৩৫ জনের মুসলিম প্রতিনিধিদল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করতে যান। পূর্ববঙ্গের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সিমলা ডেপুটেশনে যোগদান করেন। এটাই ঐতিহাসিক সিমলা ডেপুটেশন।

স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি

প্রতিনিধিবর্গ একটি স্মারকলিপিতে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দাবিসমূহ ভাইসরয়ের সামনে তুলে ধরেন। তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে, পূর্বের কাউন্সিলসমূহে মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। তা ছাড়া মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত অনেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তাঁরা বড়লাটের কাছে দাবি করেন যে, মুসলমানদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি লক্ষ রেখে তাদেরকে জনসংখ্যার শক্তির চেয়েও বেশি প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দিতে হবে। স্থানীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিগণ তাদের পৃথক মুসলিম নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিক সংখ্যক মুসলমানদের নিয়োগ দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনে তাদের প্রতিনিধি রাখার জন্য ডেপুটেশনের সদস্যরা দাবি করেন।

বড়লাট মিন্টোর নীতিগত সমর্থন

বড়লাট মিন্টো সহানুভূতির সঙ্গে মুসলিম প্রতিনিধিদলের বক্তব্য শোনেন। তিনি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যতদিন তাঁর কিছু করার থাকবে ততদিন তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বিবেচনা করবেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ না রেখে ভোটাধিকার ভিত্তিক যে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হলে তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমান প্রতিনিধিদেরকে দেয়া বড়লাটের প্রতিশ্রুতি কোন মিথ্যা আশ্বাস ছিল না। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং জনসংখ্যার তুলনায় তারা অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়।

সার-সংক্ষেপ

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সিমলা ডেপুটেশন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন পরিষদের সংস্কারের উদ্যোগের মুখে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সিমলায় সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব আরও বৃদ্ধিসহ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার দাবি জানান। বড়লাট তাদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে তা বাস্তবায়িত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বড়লাট ছিলেন —
   ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
   গ. লর্ড মিন্টো ঘ. লর্ড চেমস্‌ফোর্ড

২. লর্ড মর্লি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ঘোষনা দেন —
   ক. সাংবাদিক সম্মেলনে খ. বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বক্তৃতাকালে
   গ. ঘরোয়া আলোচনায় ঘ. জনসভার বক্তৃতায়

৩. সিমলা ডেপুটেশনে মুসলিম প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন —
   ক. মহসীন-উল-মুলক খ. স্যার সলিমুল্লাহ
   গ. তৃতীয় আগা খান ঘ. এ.কে.ফজলুল হক

৪. বৃটিশ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মেনে নেয় —
   ক. ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. সিমলা ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য কি ছিল?
২. সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমান প্রতিনিধিগণ কি কি দাবি উত্থাপন করেছিলেন?
৩. লর্ড মিন্টোর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ ৮

মুসলিম লীগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলিম লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রথম দিকে এ দলের সাংগঠনিক চরিত্র কি ছিল তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

স্বাতন্ত্রবাদী চিন্তা ধারার ফসল

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের জন্ম উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ন ঘটনা। উনিশ শতকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ফল হিসেবে একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়, তেমনি কংগ্রেসের রাজনীতি হতে দূরে থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেও এগিয়ে আসে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এ রূপ স্বাতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক ধারারই ফল।

মুসলিম নেতাদের উদ্যোগে বিভিন্ন সংগঠনের সৃষ্টি

মুসলমানদের চরম দুর্দিনে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং ইংরেজ বিদ্বেষ পোষণ করে এ সময় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং চাকুরি সহ সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে ছিল। স্যার সৈয়দ ও বাংলার নেতা নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সৈয়দ আহমদ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরে 'বিজ্ঞান সমিতি', ১৮৭৫ সলে আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের সচেতন ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বাংলার আরেক নেতা সৈয়দ আমির আলী

প্রতিষ্ঠা করেন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন।

সৈয়দ আমির আলী প্রথমে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন দিয়ে কিছুদিন পর তা প্রত্যাহার করেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের কর্মসূচীর প্রতি সর্বাংশে সমর্থন মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সর্বনাশ ডেকে আনবে। নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদী নীতি মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

মুসলমানদের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত চেতনায় আঘাত এবং তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরো কতিপয় ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের চেতনাকে শাণিত করে। বেনারসে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দী-উর্দু বিতর্ক, হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় উৎসবাদির আয়োজন, যেমন— নবগোপাল মিত্রের হিন্দু-মেলা ও শিবাজী উৎসব, উত্তর ভারত জুড়ে গো-জবাই নিবারণ সমিতি ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত চেতনাকে আহত করে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের দৈন্য-দশা তাদেরকে অস্তিত্ব রক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের দিকে কতিপয় বিশেষ সরকারী কাজে উর্দুর বদলে দেবনাগরী হরফে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিলে সেখানকার মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮ আগস্ট লক্ষ্ণৌতে মুসলমান প্রতিনিধিরা একটা সভা ডাকে। আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী মহসীন-উল-মুল্‌কের নেতৃত্বে 'উর্দু প্রতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে অরেকটি সভায় মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে একটি জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনরায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে উত্তর প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে সাহারানপুরের এক জনসভায় ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে।

বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সংখ্যগরিষ্ঠ মুসলমানরা অধিকতর সুযোগ সুবিধার আশায় নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারী পদক্ষেপকে সমর্থন জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন এ অঞ্চলের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা নিজেদের জন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা এ সময় আরো বেশি করে অনুভব করে। বিশেষকরে বঙ্গভঙ্গ পক্ষের নেতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী জাতীয় কংগ্রেসের বিপরীতে একটি রাজনৈতিক দলের তাগিদ তীব্রভাবে অনুভব করেন।

পরবর্তী বছরের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় ভারত সচিব লর্ড মর্লে ভারতের জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগের কথা ব্যক্ত করেন। বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুভূতি ও বক্তব্য সরকারের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন। মহসীন-উল-মুল্‌কের উদ্যোগে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর ৩৫ সদস্যের মুসলিম প্রতিনিধিদল আগা খানের নেতৃত্বে সিমলায় ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে মত বিনিময় করেন। ইতিহাসে এটি সিমলা ডেপুটেশন নামে খ্যাত। নওয়াব সলিমুল্লাহর অনুরোধে সমবেত নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সিমলায় পরস্পর মত বিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, ডিসেম্বর মাসে ঢাকায়

অনুষ্ঠেয় মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সভায় দল গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমান নেতাদের মধ্যে নব উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে এবং শীঘ্রই তাঁরা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেন্সী' নামে একটি দলের প্রস্তাব দেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে'র বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনের শেষ দিনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম প্রতিনিধিগণ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত দলের যুগ্ম-আহবায়ক নির্বাচিত হন নবাব মহসীন-উল-মুল্‌ক ও ভিকার-উল-মুল্‌ক। প্রাথমিকভাবে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়

ক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতা ও আনুগত্যের মনোভাব বজায় রাখা।

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

গ. উপরোক্ত লক্ষ্যের কোন ক্ষতি না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলা।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত তৈরি করে। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তবে উল্লেখ্য যে, অভিজাত সম্প্রদায় তথা নাইট, নবাব ও ভূস্বামী জমিদার জোতদারদের প্রাধান্যের কারণে বহুদিন পর্যন্ত গণমানুষের সাথে মুসলিম লীগের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-বিভক্তির মাত্র কিছুদিন পূর্বেই এটি মুসলমানদের প্রকৃত সংগঠনে পরিণত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ঐ সময় মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জন করে।

সার-সংক্ষেপ

মুসলিম লীগের আবির্ভাব উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব থেকেই এর প্রতিষ্ঠা। ঊনবিংশ শতাব্দীর উগ্র হিন্দুবাদী কার্যকলাপ ও মুসলিম স্বার্থবিরোধী তৎপরতা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং ক্রমশ নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার তাগিদে তারা পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এ দলের প্রতিষ্ঠা এরই পরিণতি মাত্র। কিন্তু ব্যাপক ভিত্তিক জন-সমর্থিত দল রূপে গড়ে উঠতে এর অনেক সময় লাগে এবং ১৯৪০ দশকের পূর্বে তা সম্ভব হয়নি। মুসলিম লীগই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. 'মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন—

ক. নবাব আবদুল লতিফ খ. স্যার সৈয়দ আহমদ খান

গ. নবাব সলিমুল্লাহ ঘ. মহসীন-উল-মুল্‌ক

২. ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দী-উর্দু বিতর্ক দেখা দেয় —

ক. বেনারসে খ. ভুবনেশ্বরে
গ. কেরালায় ঘ. রাজশাহীতে

৩. নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে গঠিত মুসলমানদের জন্য নতুন সংগঠনটির নাম ছিল—
ক. জাতীয় মুসলিম লীগ খ. মুসলিম আজাদী লীগ
গ. অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেন্সী ঘ. মুসলিম গণআজাদী লীগ

৪. মুসলিম লীগের বিশিষ্ট অবদান ছিল —
ক. বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানো খ. পাকিস্তান অর্জন
গ. হিন্দু-মুসলমানদের মিলন ঘ. কংগ্রেসকে প্রতিহত করা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।
২. শুরুতে মুসলিম লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল?

পাঠ ৯

মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মর্লি-মিন্টো সংস্কার কেন প্রবর্তিত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- মর্লি-মিন্টো সংস্কারের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পটভূমি

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইন ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তারা উপলব্ধি করে যে ভারতের জনগণকে কোন প্রকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার প্রদান করতে বৃটিশ সরকার আদৌ আগ্রহী নয়। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠায় এবং ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বৃটিশ বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করে ঔপনিবেশিক সরকার সংস্কারের কথা চিন্তা করে। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ- এহেন পরিস্থিতিতে সরকার বুঝেছিল যে, কেবলমাত্র দমনমূলক নীতির মাধ্যমে এ অশান্ত পরিবেশের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডে উদারনৈতিক দলের ক্ষমতা লাভ, ভারতে লর্ড কার্জনের স্থলে বড়লাট হিসেবে লর্ড মিন্টোর দায়িত্ব গ্রহণ এবং ভারত সচিব পদে লর্ড মর্লির নিয়োগ ভারতের রাজনীতিতে সঞ্চার করে এক নতুন গতিবেগ। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে দলের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী উপদলের উদ্ভব পরিস্থিতিকে খানিকটা বৃটিশের পক্ষে অনুকূল করে তোলে। বৃটিশ পার্লামেন্টে বাজেট ভাষণে মর্লির ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আভাস কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। লর্ড মর্লি ও বড়লাট মিন্টো উভয়েই নিজেদের মধ্যে মতের আদান প্রদানের পর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য যে আইন পাশ করা হয় তাকেই বলা হয় মর্লি-মিন্টো সংস্কার

ফেব্রুয়ারি মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য যে আইন পাশ হয় তা মর্লি-মিন্টো সংস্কার বা ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইনে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভের নীতি গৃহীত হয়। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। বোম্বে ও মাদ্রাজের গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪ জনে উন্নীত করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৬০ পর্যন্ত করা হয়। এর মধ্যে ২৮ জনের বেশি সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন না। কতগুলো বিশিষ্ট সম্প্রদায় থেকে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করার অধিকার বড়লাটকে দেয়া হয়। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়, জমিদার শ্রেণী, কলিকাতা ও বোম্বের চেম্বার অব কর্মাস এবং প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বমোট ২৭ জনকে মনোনীত করবেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার নীতি গৃহীত হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রদেশগুলোতে অতিরিক্ত সদস্যের সর্বাধিক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ৫০ জনে। তবে এ বৃদ্ধি এমনভাবে করা হয় যাতে নির্বাচিত সদস্যদের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে। একমাত্র বাংলায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা অধিক রাখা হয়।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার করে এ আইনে মুসলিম সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের (পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা) অধিকার দেয়া হয়। তাছাড়া আইন সভাগুলোকে বাজেট নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব উত্থাপন করার এবং জন-স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করার অধিকার প্রদান করা হয়। অবশ্য ঐসব প্রস্তাব অগ্রাহ্য বা বাতিল করার ক্ষমতা সরকারের হাতে রাখা হয়। তবে দেশীয় রাজ্য, সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রস্তাব গ্রহণ বা আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল।

সংস্কার আইনের সীমাবদ্ধতা

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। আইন সভার নির্বাচিত সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন না। তাছাড়া তাদেরকে কোন ক্ষমতাও দেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে তারা সব সময়ই সংখ্যালঘু ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সংস্কার আইনের মাধ্যমে ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন ইচ্ছাই ইংরেজদের ছিল না। ভারত সচিব মর্লে স্পষ্টতই বলেছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভারতকে দেয়া সম্ভব নয়। বড় লাট মিন্টোরও উক্তি ছিল যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন ভারতের জন্য উচিত হবে না। তাই কংগ্রেসের নরমপন্থীদের পক্ষে আনা যদি মর্লি-মিন্টো সংস্কারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে স্বীকার করতে হবে যে সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মেনে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার দূর দৃষ্টির পরিচয় দেয়।

সংস্কার আইনের প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পৃথক অবস্থান

মর্লি-মিন্টো সংস্কারে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায় জাতীয় কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস এ ধরণের নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অধিবেশনের সভাপতি মদন মোহন মালাভীয়া সরকারের বিভেদমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হবে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী একে মারাত্মক নীতি বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথাকে স্বাগত জানায়। নাগপুরে অনুষ্ঠিত

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারত সচিব ও বড়লাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

বিশ শতকের প্রথমদিকে উত্তপ্ত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রশমিত করার জন্য মর্লি-মিন্টো সংস্কার ছিল একটা কৌশলগত পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করায় স্বভাবতই তারা খুশী হয়, যদিও কংগ্রেস এতে ক্ষুব্ধ ছিল। কংগ্রেসের নরমপন্থীরাও সন্তুষ্ট ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. লর্ড মিন্টো ছিলেন —
   ক. ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী খ. হাউস অব লডস্-এর প্রেসিডেন্ট
   গ. ভারতের বড়লাট ঘ. ভারত সচিব

২. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যা —
   ক. ২ জন খ. ১ জন
   গ. ৩ জন ঘ. একজনও নয়

৩. মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের প্রধান অভিনবত্ব —
   ক. ফেডারেশন পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন খ. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা
   গ. ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান ঘ. প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রবর্তন

৪. 'স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভারতকে দেয়া যায় না' উক্তিটি করেছেন—
   ক. লর্ড মর্লি খ. লর্ড উইলিংটন
   গ. লর্ড মিন্টো ঘ. বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মর্লি-মিন্টো সংস্কার কেন প্রবর্তিত হয়েছিল?
২. মর্লি-মিন্টো সংস্কারের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি?
৩. মর্লি-মিন্টো সংস্কারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল?

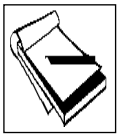

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৯ ঃ রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নওয়াব আব্দুল লতিফের কর্মময় জীবনের বর্ণনা দিন।

২. বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক অগ্রগতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর আলীর অবদান বর্ণনা করুন।

৩. আলীগড় আন্দোলন কি? এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য সৈয়দ আহমদ খানের অবদানের মূল্যায়ন করুন।

৪. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

৫. জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে এর উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. বঙ্গভঙ্গের পেছনে লর্ড কার্জনের কি কি উদ্দেশ্য ছিল? এর প্রতি মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৭. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৮. বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৯. ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সিমলা ডিপুটেশনের পটভূমি বর্ণনা করুন। এই ডেপুটেশনে মুসলমানদের উত্থাপিত দাবিসমূহ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন।

১১. মর্লি-মিন্টো সংস্কারের পটভূমি আলোচনা করে এর বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখুন।

উত্তরমালাঃ

পাঠ - ৯.১	⇒	১. গ	২. খ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ - ৯.২	⇒	১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. ঘ
পাঠ - ৯.৩	⇒	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. গ
পাঠ - ৯.৪	⇒	১. খ	২. ক	৩. খ	৪. গ
পাঠ - ৯.৫	⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. খ
পাঠ - ৯.৬	⇒	১. খ	২. খ	৩. গ	৪. ক
পাঠ - ৯.৭	⇒	১. গ	২. খ	৩. গ	৪. গ
পাঠ - ৯.৮	⇒	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. খ
পাঠ - ৯.৯	⇒	১. গ	২. খ	৩. খ	৪. ক